সূরা আল-আহযাব:৪র্থ রুকু (২৮-৩৪)আয়াত

Sisters'Forum In Islam.com

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يٰٓاَيُّهَا النَّبِىُّ قُلْ لِّاَزْوَاجِكَ اِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَ زِيْنَتَهَا فَتَعَالَيْنَ اُمَتِّعْكُنَّ وَ اُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيْلًا ৩৩ : ২৮

২৮. হে নবী! আপনি আপনার স্ত্রীদেরকে বলুন, তোমরা যদি দুনিয়ার জীবন ও এর চাকচিক্য কামনা কর। তবে আস, আমি তোমাদের ভোগ-সমগ্রীর ব্যবস্থা করে দেই এবং সৌজন্যের সাথে তোমাদেরকে বিদায় দেই।

এখান থেকে ৩৫ আয়াত পর্যন্ত আহযাব ও বনী কুরাইযার যুদ্ধের সন্নিহিত সময়ে নাযিল হয়েছিল। সহীহ মুসলিমে হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা.) সে যুগের একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, একদিন হযরত আবু বকর (রা.) ও হযরত উমর (রা.) নবী করীমের ﷺ খেদমতে হাজির হয়ে দেখেন তাঁর স্ত্রীগণ তাঁর চারদিকে বসে আছেন এবং তিনি কোন কথা বলছেন না। নবী করীম ﷺ হযরত উমরকে সম্বোধন করে বললেন, هُنَّ كَمَا تَرَى يَسأَلْنَنِى النَّفَقَة "তুমি দেখতে পাচ্ছো, এরা আমার চারদিকে বসে আছে এবং আমার কাছে খরচপত্রের জন্য টাকা চাচ্ছে।" একথা শুনে তাঁরা উভয়ে নিজ নিজ মেয়েকে ধমক দিলেন এবং তাদেরকে বললেন, তোমরা রসূললুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কষ্ট দিচ্ছো এবং এমন জিনিস চাচ্ছো যা তাঁর কাছে নেই। এ ঘটনা থেকে বুঝা যায়, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আর্থিক সংকট সে সময় কেমন ঘনীভূত ছিল এবং কুফর ও ইসলামের চরম দ্বন্দ্বের দিনগুলোতে খরচপাতির জন্য পবিত্র স্ত্রীগণের তাগাদা তাঁর পবিত্র ব্যক্তিত্বকে কিভাবে বিচলিত করে তুলছিল।

উল্লেখিত আয়াতসমূহে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পুণ্যবতী স্ত্রীগণের প্রতি বিশেষ নির্দেশ রয়েছে যেন তাদের কোন কথা ও কাজের দ্বারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রতি কোন দুঃখ-যন্ত্রণা না পৌঁছে; সেদিকে যেন তারা যথাযথ গুরুত্ব আরোপ করেন। [ফাতহুল কাদীর] আয়াতে রাসূলের স্ত্রীদেরকে তালাক গ্রহণের যে অধিকার প্রদানের কথা বর্ণনা করা হয়েছে, এ সম্পর্কিত পুণ্যবতী স্ত্রীগণ কর্তৃক সংঘটিত এক বা একাধিক এমন ঘটনা রয়েছে, যা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মার্জির পরিপন্থী ছিল, যদ্বারা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অনিচ্ছাকৃতভাবেই দুঃখ পান। এসব ঘটনাবলীর মধ্যে একটি ঘটনা হচ্ছে, একদিন স্ত্রীগণ সমবেতভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর খেদমতে তাদের জীবিকা ও অন্যান্য খরচাদির পরিমান বৃদ্ধির দাবী পেশ করেন। [মুসলিম: ১৪৭৮]

وَ اِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ وَ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ فَاِنَّ اللّٰهَ اَعَدَّ لِلْمُحْسِنٰتِ مِنْكُنَّ اَجْرًا عَظِيْمًا ৩৩ : ২৯

২৯. আর যদি তোমরা কামনা কর আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও আখিরাতের আবাস, তবে তোমাদের মধ্যে যারা সৎকর্মশীলা আল্লাহ তাদের জন্য মহাপ্রতিদান প্রস্তুত রেখেছেন।

বিভিন্ন দেশ জয়লাভ করার পর যখন মুসলিমদের অবস্থা পূর্বের তুলনায় কিছুটা সচ্ছল হল, তখন মুহাজির ও আনসারদের স্ত্রীদের দেখাদেখি মহানবী (সাঃ)-এর স্ত্রীগণও খোরপোষের পরিমাণ বৃদ্ধির দাবী জানালেন। নবী (সাঃ) যেহেতু বিলাসহীন জীবন-যাত্রা পছন্দ করতেন, সেহেতু স্ত্রীদের এই দাবীতে বড় দুঃখিত হলেন এবং এক মাসের জন্য স্ত্রীদের নিকট থেকে আলাদা হয়ে একাকী বাস করলেন।অবশেষে আল্লাহ তাআলা এই আয়াত অবতীর্ণ করলেন।

এ আয়াতে সকল পুণ্যবতী স্ত্রীগণকে অধিকার প্রদান করা হয়েছে যে, তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বর্তমান দারিদ্র্যপীড়িত চরম আর্থিক সঙ্কটপূর্ন অবস্থা বরণ করে হয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে দাম্পত্য সম্পর্ক অক্ষুন্ন রেখে জীবন যাপন করবেন অথবা তালাকের মাধ্যমে তার থেকে মুক্ত হয়ে যাবেন।

প্রথমাবস্থায় অন্যান্য স্ত্রীলোকের তুলনায় পুরস্কার এবং আখেরাতে স্বতন্ত্র ও সুউচ্চ মর্যাদাসমূহের অধিকারী হবেন।

আর দ্বিতীয় অবস্থা, অর্থাৎ তালাক গ্রহণের পরিপ্রেক্ষিতেও তাদেরকে দুনিয়ার অপরাপর লোকের ন্যায় বিশেষ জটিলতা ও অপ্রীতিকর অবস্থার সম্মুখীন হতে হবে না; বরং সুন্নত মোতাবেক যুগল বস্তু প্রভৃতি প্রদান করে সসম্মানে বিদায় দেয়া হবে। ইসলামী পরিভাষায় একে বলা হয় “তাখঈর” । অর্থাৎ স্ত্রীকে তার স্বামীর সাথে থাকার বা আলাদা হয়ে যাবার মধ্য থেকে যে কোন একটিকে বাছাই করে নেবার ফায়সালা করার ইখতিয়ার দান করা। [ফাতহুল কাদীর; বাগাবী]

উক্ত আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর সর্বপ্রথম তিনি আয়েশা (রাঃ) -কে উক্ত আয়াত শুনিয়ে তাঁকে তাঁর সংসারে থাকা ও না থাকার ব্যাপারে এখতিয়ার দিলেন এবং বললেন, নিজে সিদ্ধান্ত না নিয়ে পিতা-মাতার পরামর্শ নিয়ে যা করার করবে। আয়েশা (রাঃ) বললেন, আপনার বিষয়ে পরামর্শ করব তা কি করে হয়? বরং আমি আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে পছন্দ করি। অন্য সকল স্ত্রীগণও এই একই মত ব্যক্ত করলেন এবং কেউ নবী (সাঃ)-কে ত্যাগ করে পার্থিব প্রাচুর্য ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যকে প্রাধান্য দিলেন না। (সহীহ বুখারী, তাফসীর সূরা আহযাব)

অনেকে স্বামীর পক্ষ থেকে স্ত্রীকে পৃথক হয়ে যাওয়ার এখতিয়ারকে ত্বালাক বলে গণ্য করেন। কিন্তু এ কথা সঠিক নয়। সঠিক মাসআলা এই যে, এখতিয়ার দেওয়ার পর যদি স্ত্রী পৃথক হয়ে যাওয়াকে বেছে নেয়, তাহলে অবশ্যই ত্বালাক হয়ে যাবে। (আর তা হবে ত্বালাকে রাজয়ী; ত্বালাকে বায়েনাহ নয়, যেমন কিছু উলামার মত।) আর যদি স্ত্রী পৃথক হয়ে যাওয়াকে বেছে না নেয়, তাহলে ত্বালাক হবে না। যেমন নবী (সাঃ)-এর স্ত্রীগণ পৃথক না হয়ে তাঁর সাথে থাকাকে বেছে নিয়েছিলেন। অথচ এই বেছে নেওয়াকে ত্বালাক গণ্য করা হয়নি। (বুখারীঃ ত্বালাক অধ্যায়, মুসলিম)

এ আয়াতটি নাযিল হবার সময় নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রী ছিল চারজন। তাঁরা ছিলেন হযরত সওদা (রা.), হযরত আয়েশা (রা.), হযরত হাফসা (রা.) এবং হযরত উম্মে সালামাহ (রা.)। তখনো হযরত

যয়নবের (রা.) সাথে নবী করীমের ﷺ বিয়ে হয়নি। (আহকামুল কুরআন, ইবনুল আরাবী, ১৯৫৮ সালে মিসর থেকে মুদ্রিত, ৩ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫১২-৫১৩) এ আয়াত নাযিল হবার পর নবী করীম ﷺ সর্বপ্রথম হযরত আয়েশার সাথে আলোচনা করেন এবং বলেন, "আমি তোমাকে একটি কথা বলছি, জবাব দেবার ব্যাপারে তাড়াহুড়া করো না। তোমার বাপ-মায়ের মতামত নাও এবং তারপর ফায়সালা করো।" তারপর তিনি তাঁকে বলেন, আল্লাহর পক্ষ থেকে এ হুকুম এসেছে এবং তাঁকে এ আয়াত শুনিয়ে দেন। হযরত আয়েশা বলেন, "এ ব্যাপারটি কি আমি আমার বাপ-মাকে জিজ্ঞেস করবো? আমি তো আল্লাহ, তাঁর রসূল ও আখেরাতকে চাই।" এরপর নবী ﷺ এক এক করে তাঁর অন্যান্য পবিত্র স্ত্রীদের প্রত্যেকের কাছে যান এবং তাঁদেরকে একই কথা বলেন। তারা প্রত্যেকে হযরত আয়েশার (রা.) মতো একই জবাব দেন। (মুসনাদে আহমাদ, মুসলিম ও নাসাঈ)

ইসলামী পরিভাষায় একে বলা হয় "তাখঈর।" অর্থাৎ স্ত্রীকে তার স্বামীর থাকার বা আলাদা হয়ে যাবার মধ্য থেকে যে কোন একটিকে বাছাই করে নেবার ফায়সালা করার ইখতিয়ার দান করা। এই তাখঈর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর ওয়াজিব ছিল। কারণ আল্লাহ তাঁকে এর হুকুম দিয়েছিলেন। যদি তাঁর পবিত্র স্ত্রীগণের কেউ আলাদা হয়ে যাবার পথ অবলম্বন করতেন তাহলে তিনি আপনা আপনিই আলাদা হয়ে যেতেন না বরং নবী করীমের ﷺ আলাদা করে দেবার কারণে আলাদা হয়ে যেতেন যেমন আয়াতের শব্দাবলী থেকে সুস্পষ্ট হচ্ছেঃ "এসো আমি কিছু দিয়ে তোমাদের ভালোভাবে বিদায় করে দেই।" কিন্তু এ অবস্থায় তাঁকে আলাদা করে দেয়া নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর ওয়াজিব ছিল। কারণ নিজের প্রতিশ্রুতি পালন না করা নবী হিসেবে তাঁর জন্য সমীচীন ছিল না।

আলাদা হয়ে যাবার পর বাহ্যত এটাই মনে হয়, মু'মিনের মাতার তালিকা থেকে তাঁর নাম কাটা যেতো এবং অন্য মুসলমানের সাথে তাঁর বিবাহ আর হারাম থাকতো না। কারণ তিনি দুনিয়া এবং তার সাজসজ্জার জন্যই তো রসূলে করীমের ﷺ থেকে আলাদা হতেন এবং এর অধিকার তাঁকে দেয়া হয়েছিল। আর একথা সুস্পষ্ট যে, অন্য কারো সাথে বিবাহ নিষিদ্ধ থাকলে তাঁর এ উদ্দেশ্য পূর্ণ হতো না। অন্যদিকে আয়াতের এটিও একটি উদ্দেশ্য মনে হয়, নবী করীমের ﷺ যে সকল স্ত্রী আল্লাহ, তাঁর রসূল ও আখেরাতকে পছন্দ করে নিয়েছেন তাঁদেরকে তালাক দেবার ইখতিয়ার নবীর আর থাকেনি। কারণ তাখঈরের দু'টি দিক ছিল। এক, দুনিয়াকে গ্রহণ করলে তোমাদেরকে আলাদা করে দেয়া হবে। দুই, আল্লাহ, তাঁর রসূল ও আখেরাতকে গ্রহণ করলে তোমাদের আলাদা করে দেয়া হবে না। এখন একথা সুস্পষ্ট, এ দু'টি দিকের মধ্য থেকে যে কোন একটি দিকই কোন মহিমান্বিতা মহিলা গ্রহণ করলে দ্বিতীয় দিকটি স্বাভাবিকভাবেই তাঁর জন্য নিষিদ্ধ হয়ে যেতো।

ইসলামী ফিকহে "তাখঈর" আসলে তালাকের ক্ষমতা অর্পণ করার পর্যায়ভুক্ত। অর্থাৎ স্বামী এর মাধ্যমে স্ত্রীকে এ ক্ষমতা দেয় যে, সে চাইলে তার স্ত্রী হিসেবে থাকতে পারে এবং চাইলে আলাদা হয়ে যেতে পারে। এ বিষয়টির ব্যাপারে কুরআন ও সুন্নাহ থেকে ইজতিহাদের মাধ্যমে ফকীহগণ যে বিধান বর্ণনা করেছেন তার সংক্ষিপ্ত সার নিম্নরূপঃ

একঃ এ ক্ষমতা একবার স্ত্রীকে দিয়ে দেবার পর স্বামী আর তা ফেরত নিতে পারে না এবং স্ত্রীকে তা ব্যবহার করা থেকে বিরত রাখতেও পারে না। তবে স্ত্রীর জন্য তা ব্যবহার করা অপরিহার্য হয়ে যায় না। সে চাইলে

স্বামীর সাথে থাকতে সম্মত হতে পারে, চাইলে আলাদা হয়ে যাবার কথা ঘোষণা করতে পারে এবং চাইলে কোন কিছুর ঘোষণা না দিয়ে এ ক্ষমতাকে এমনিই নষ্ট হয়ে যাবার সুযোগ দিতে পারে।

দুইঃ এ ক্ষমতাটি স্ত্রীর দিকে স্থানান্তরিত হবার জন্য দু' টি শর্ত রয়েছে। প্রথমত স্বামী কর্তৃক তাকে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় তালাকের ইখতিয়ার দান করা চাই, অথবা তালাকের কথা সুস্পষ্ট ভাষায় না বললেও এ ইখতিয়ার দেবার নিয়ত তার থাকা চাই। যেমন, সে যদি বলে, "তোমার ইখতিয়ার আছে" বা "তোমার ব্যাপার তোমার হাতে আছে," তাহলে এ ধরনের ইঙ্গিতধর্মী কথার ক্ষেত্রে স্বামীর নিয়ত ছাড়া তালাকের ইখতিয়ার স্ত্রীর কাছে স্থানান্তরিত হবে না।

যদি স্ত্রী এর দাবী করে এবং স্বামী হলফ সহকারে বিবৃতি দেয় যে, এর মাধ্যমে তালাকের ইখতিয়ার সোপর্দ করার উদ্দেশ্য তার ছিল না, তাহলে স্বামীর কথা গ্রহণ করা হবে।

তবে স্ত্রী যদি এ মর্মে সাক্ষ্য হাজির করে যে, অবনিবনা ঝগড়া বিবাদের পরিবেশে বা তালাকের কথাবার্তা চলার সময় একথা বলা হয়েছিল, তাহলে তখন তার দাবী বিবেচিত হবে। কারণ এ প্রেক্ষাপটে ইখতিয়ার দেবার অর্থ এটাই বুঝা যাবে যে, স্বামীর তালাকের ইখতিয়ার দেবার নিয়ত ছিল।

দ্বিতীয়ত স্ত্রীর জানতে হবে যে, তাকে এ ইখতিয়ার দেয়া হয়েছে। যদি সে অনুপস্থিত থাকে, তাহলে তার কাছে এ খবর পৌঁছতে হবে এবং যদি সে উপস্থিত থাকে, তাহলে এ শব্দগুলো তার শুনতে হবে। যতক্ষণ সে নিজ কানে শুনবে না অথবা তার কাছে খবর পৌঁছবে না ততক্ষণ ইখতিয়ার তার কাছে স্থানান্তরিত হবে না।

তিনঃ যদি স্বামী কোন সময় নির্ধারণ করা ছাড়াই শর্তহীনভাবে স্ত্রীকে ইখতিয়ার দান করে, তাহলে স্ত্রী কতক্ষণ পর্যন্ত এ ইখতিয়ার প্রয়োগ করতে পারে? এ ব্যাপারে ফকীহদের মধ্যে মতবিরোধ পাওয়া যায়।

একটি দল বলেন, যে বৈঠকে স্বামী একথা বলে সে বৈঠকেই স্ত্রী তার ইখতিয়ার প্রয়োগ করতে পারে। যদি সে কোন জবাব না দিয়ে সেখান থেকে উঠে যায় অথবা এমন কাজে লিপ্ত হয় যা একথাই প্রমাণ করে যে, সে জবাব দিতে চায় না, তাহলে তার ইখতিয়ার বাতিল হয়ে যাবে। এ মত পোষণ করেন হযরত উমর (রা.), হযরত উসমান (রা.), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.), হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা.), হযরত জাবের ইবনে যায়েদ, আতা (র), মুজাহিদ (র), শা' বী (র), ইবরাহীম নাখঈ (র), ইমাম মালেক (র), ইমাম আবু হানীফা (র), ইমাম শাফেঈ (র), ইমাম আওযায়ী (র), সুফিয়ান সওরী (র) ও আবু সওর (র)।
দ্বিতীয় দলের মতে, তার ইখতিয়ার ঐ বৈঠক পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকবে না বরং তারপরও সে এ ইখতিয়ার প্রয়োগ করতে পারবে। এ মত পোষণ করেন হযরত হাসান বসরী (র), কাতাদাহ ও যুহরী।

চারঃ স্বামী যদি সময় নির্ধারণ করে দেয়। যেমন, সে যদি বলে, এক মাস বা এক বছর পর্যন্ত তোমাকে ইখতিয়ার দিলাম অথবা এ সময় পর্যন্ত তোমার বিষয় তোমার হাতে রইলো, তাহলে ঐ সময় পর্যন্ত সে এ ইখতিয়ার ভোগ করবে। তবে যদি সে বলে, তুমি যখন চাও এ ইখতিয়ার ব্যবহার করতে পারো, তাহলে এ অবস্থায় তার ইখতিয়ার হবে সীমাহীন।

পাঁচঃ স্ত্রী যদি আলাদা হতে চায়, তাহলে তাকে সুস্পষ্ট ও চূড়ান্ত অর্থবোধক শব্দাবলীর মাধ্যমে তা প্রয়োগ করতে হবে। অস্পষ্ট শব্দাবলী, যার মাধ্যমে বক্তব্য সুস্পষ্ট হয় না, তা দ্বারা ইখতিয়ার প্রয়োগ কার্যকর হতে পারে না।

ছয়ঃ আইনত স্বামীর পক্ষ থেকে স্ত্রীকে ইখতিয়ার দেবার জন্য তিনটি বাক্য ব্যবহার করা যেতে পারে।

এক, সে বলবে, "তোমার ব্যাপারটি তোমার হাতে রয়েছে।"

দুই, সে বলবে, "তোমাকে ইখতিয়ার দেয়া হচ্ছে।"

তিন, সে বলবে, "যদি তুমি চাও তাহলে তোমাকে তালাক দিলাম।" এর মধ্যে প্রত্যেকটির আইনগত ফলাফল হবে ভিন্ন রকমেরঃ

(ক) "তোমার বিষয়টি তোমার হাতে রয়েছে" --এ শব্দগুলো যদি স্বামী বলে থাকে এবং স্ত্রী এর জবাবে এমন কোন স্পষ্ট কথা বলে যা থেকে বুঝা যায় যে, সে আলাদা হয়ে গেছে, তাহলে হানাফী মতে এক তালাক বায়েন হয়ে যাবে। অর্থাৎ এরপর স্বামী আর স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিতে পারবে না। কিন্তু ইদ্দত অতিবাহিত হবার পর উভয়ে আবার চাইলে পরস্পরকে বিয়ে করতে পারে। আর যদি স্বামী বলে থাকে, "এক তালাক পর্যন্ত তোমার বিষয়টি তোমার হাতে রয়েছে," তাহলে এ অবস্থায় একটি 'রজঈ' তালাক অনুষ্ঠিত হবে। (অর্থাৎ ইদ্দতের মধ্যে স্বামী চাইলে স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিতে পারে।) কিন্তু স্বামী যদি বিষয়টি স্ত্রীর হাতে সোপর্দ করতে গিয়ে তিন তালাকের নিয়ত করে থাকে অথবা একথা সুস্পষ্ট করে বলে থাকে, তাহলে সে সুস্পষ্ট ভাষায় নিজের ওপর তিন তালাক আরোপ করুক অথবা কেবলমাত্র একবার বলুক আমি আলাদা হয়ে গেলাম বা নিজেকে তালাক দিলাম, এ অবস্থায় স্ত্রীর ইখতিয়ার তালাকের সমার্থক হবে।

(খ) "তোমাকে ইখতিয়ার দিলাম" শব্দগুলোর সাথে যদি স্বামী স্ত্রীকে আলাদা হয়ে যাওয়ার ইখতিয়ার দিয়ে থাকে এবং স্ত্রী আলাদা হয়ে যাওয়ার কথা স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করে থাকে, তাহলে হানাফীর মতে স্বামীর তিন তালাকের ইখতিয়ার দেবার নিয়ত থাকলেও একটি বায়েন তালাকই অনুষ্ঠিত হবে। তবে যদি স্বামীর পক্ষ থেকে তিন তালাকের ইখতিয়ার দেবার কথা সুস্পষ্টভাবে বলা হয়ে থাকে, তাহলে স্ত্রীর তালাকের ইখতিয়ারের মাধ্যমে তিন তালাক অনুষ্ঠিত হয়ে যাবে। ইমাম শাফেঈর (র) মতে, যদি স্বামী ইখতিয়ার দেবার সময় তালাকের নিয়ত করে থাকে এবং স্ত্রী আলাদা হয়ে যায়, তাহলে একটি রজঈ তালাক অনুষ্ঠিত হবে। ইমাম মালেকের (র) মতে, স্বামী যদি স্ত্রীর সাথে সহবাস করে থাকে তাহলে তিন তালাক অনুষ্ঠিত হবে আর যদি সহবাস না করে থাকে, তাহলে এ অবস্থায় স্বামী এক তালাকের নিয়তের দাবী করলে তা মেনে নেয়া হবে।

(গ) "যদি তুমি চাও, তাহলে তোমাকে তালাক দিলাম" --একথা বলার পর যদি স্ত্রী তালাকের ইখতিয়ার ব্যবহার করে, তাহলে বায়েন নয় বরং একটি রজঈ তালাক অনুষ্ঠিত হবে।

সাতঃ যদি স্বামীর পক্ষ থেকে আলাদা হবার ইখতিয়ার দেবার পর স্ত্রী তার স্ত্রী হয়ে থাকার জন্য নিজের সম্মতি প্রকাশ করে, তাহলে কোন তালাক সংঘটিত হবে না। এ মত পোষণ করেন হযরত উমর (রা.), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.), হযরত আয়েশা (রা.), হযরত আবু দারদা (রা.), হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) ও

হযরত ইবনে উমর (রা.)। সংখ্যাগরিষ্ঠ ফকীহগণ এ মতই অবলম্বন করেছেন। মাসরূক হযরত আয়েশাকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। তিনি জবাব দেনঃ

خَيَّرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نِسَاءَهُ فَاخْتَرْنَهُ ، أَفَكَانَ ذَلِكَ طَلاَقًا؟

"রসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর স্ত্রীদেরকে ইখতিয়ার দিয়েছিলেন এবং তাঁরা রসূলূল্লাহরই সাথে থাকা পছন্দ করেছিলেন। একে কি তালাক বলে গণ্য করা হয়? "

এ ব্যাপারে একমাত্র হযরত আলীর (রা.) ও হযরত যায়েদ ইবনে সাবেতের (রা.) এ অভিমত উদ্ধৃত হয়েছে যে, এক্ষেত্রে একটি রজঈ তালাক অনুষ্ঠিত হবে। কিন্তু এ উভয় মনীষীর অন্য একটি বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, তাঁরাও এক্ষেত্রে কোন তালাক সংঘটিত হবে না বলে মত প্রকাশ করেছেন।

৩৩ : ৩০ يٰنِسَآءَ النَّبِيِّ مَنْ يَّأْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُّضٰعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ ؕ وَ كَانَ ذٰلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيْرًا

৩০. হে নবী-পত্নিগণ! যে কাজ স্পষ্টত ফাহেশা, তোমাদের মধ্যে কেউ তা করলে তার জন্য বাড়িয়ে দেয়া হবে শাস্তি– দ্বিগুণ এবং এটা আল্লাহর জন্য সহজ।

কুরআনে 'আলিফ-লাম' যুক্ত অবস্থায় الفَاحِشَةُ শব্দটিকে ব্যভিচারের অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু 'আলিফ-লাম' ছাড়া 'নাকিরাহ' অবস্থায় সাধারণ অশ্লীলতার অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে; যেমন এখানে। এখানে এর অর্থ হবেঃ অসভ্য ও অশোভনীয় আচরণ। কারণ নবী (সাঃ)-এর সাথে অসভ্য ও অশোভনীয় আচরণ করার মানে হচ্ছে তাঁকে কষ্ট দেওয়া, আর তা কুফরী।

এর অর্থ এ নয় যে, নাউযুবিল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র স্ত্রীদের থেকে কোন অশ্লীল কাজের আশঙ্কা ছিল। বরং এর মাধ্যমে নবীর স্ত্রীগণকে এ অনুভূতি দান করাই উদ্দেশ্য ছিল যে, ইসলামী সমাজে তাঁরা যেমন উচ্চ মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত আছেন সেই অনুযায়ী তাঁদের দায়িত্বও অনেক কঠিন। তাই তাঁদের নৈতিক চালচলন হতে হবে অত্যন্ত পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন। এটা ঠিক তেমনি যেমন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করে মহান আল্লাহ বলেনঃ

لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ "যদি তুমি শিরক করো তাহলে তোমার সমস্ত কৃতকর্ম বরবাদ হয়ে যাবে।" (আয যুমারঃ ৬৫) এর অর্থ এ নয় যে, নাউযুবিল্লাহ নবী করীম ﷺ থেকে কোন শিরকের আশঙ্কা ছিল বরং নবী করীমকে এবং তাঁর মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে শিরক কত ভয়াবহ অপরাধ এবং তাকে কঠোরভাবে এড়িয়ে চলা অপরিহার্য, সে কথা বুঝানোই ছিল উদ্দেশ্য।

অর্থাৎ তোমরা এ ভুলের মধ্যে অবস্থান করো না যে, নবীর স্ত্রী হওয়ার কারণে তোমরা আল্লাহর পাকড়াও থেকে বেঁচে যাবে অথবা তোমাদের মর্যাদা এত বেশী উন্নত যে, সে কারণে তোমাদেরকে পাকড়াও করা আল্লাহর জন্য কঠিন হয়ে যেতে পারে।

وَ مَنۡ یَّقۡنُتۡ مِنۡکُنَّ لِلّٰہِ وَ رَسُوۡلِہٖ وَ تَعۡمَلۡ صَالِحًا نُّؤۡتِہَاۤ اَجۡرَہَا مَرَّتَیۡنِ ۙ وَ اَعۡتَدۡنَا لَہَا رِزۡقًا کَرِیۡمًا ৩৩ : ৩১

৩১. আর তোমাদের মধ্যে যে কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি অনুগত হবে এবং সৎকাজ করবে তাকে আমরা পুরস্কার দেব দু'বার। আর তার জন্য আমরা প্রস্তুত রেখেছি সম্মানজনক রিযিক।

গোনাহর জন্য দু' বার শাস্তি ও নেকীর জন্য দু' বার পুরস্কার দেবার কারণ হচ্ছে এই যে, আল্লাহ যাদেরকে মানুষের সমাজে কোন উন্নত মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেন তারা সাধারণত জনগণের নেতা হয়ে যায় এবং জনগণের বিরাট অংশ ভালো ও মন্দ কাজে তাঁদেরকেই অনুসরণ করে চলে। তাঁদের খারাপ কাজ শুধুমাত্র তাঁদের একার খারাপ কাজ হয় না বরং একটি জাতির চরিত্র বিকৃতির কারণও হয় এবং তাঁদের ভালো কাজ শুধুমাত্র তাদের নিজেদের ব্যক্তিগত ভালো কাজ হয় না বরং বহু লোকের কল্যাণ সাধনেরও কারণ হয়। তাই তারা যখন খারাপ কাজ করে তখন নিজেদের খারাপের সাথে সাথে অন্যদের খারাপেরও শাস্তি পায় এবং যখনি তারা সৎকাজ করে তখন নিজেদের সৎকাজের সাথে সাথে অন্যদেরকে তারা যে সৎপথ দেখিয়েছে তারও প্রতিদান লাভ করে।

আলোচ্য আয়াত থেকে এ মূলনীতিও স্থিরীকৃত হয় যে, যেখানে মর্যাদা যত বেশী হবে এবং যত বেশী বিশ্বস্ততার আশা করা হবে যেখানে মর্যাদাহানি ও অবিশ্বস্ততার অপরাধ ততবেশী কঠোর হবে এবং এ সঙ্গে তার শাস্তিও হবে তত বেশী কঠিন। যেমন মসজিদে শরাব পান করা নিজ গৃহে শরাব পান করার চেয়ে বেশী ভয়াবহ অপরাধ এবং এর শাস্তিও বেশী কঠোর। মাহরাম নারীদের সাথে যিনা করা অন্য নারীদের সাথে যিনা করার তুলনায় বেশী গোনাহের কাজ এবং এজন্য শাস্তিও হবে বেশী কঠিন।

যেমন শাস্তি দ্বিগুণ হবে অনুরূপ পুণ্য বা নেকীও দ্বিগুণ দেওয়া হবে। যেমন নবী (সাঃ) কে আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

"আর আমরা আপনার প্রতি যা ওহী করেছি তা থেকে ওরা আপনাকে পদস্খলন ঘটাবার চেষ্টা প্রায় চূড়ান্ত করেছিল, যাতে আপনি আমাদের উপর সেটার বিপরীত মিথ্যা রটাতে পারেন; আর নিঃসন্দেহে তখন তারা আপনাকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করত। আর আমরা আপনাকে অবিচলিত না রাখলে আপনি অবশ্যই তাদের দিকে প্রায় কিছুটা ঝুঁকে পড়তেন। তাহলে অবশ্যই আমরা আপনাকে ইহজীবনে দ্বিগুণ ও পরজীবনে দ্বিগুণ শাস্তি আস্বাদন করাতাম; তখন আমাদের বিরুদ্ধে আপনার জন্য কোন সাহায্যকারী পেতেন না"। বানী ইসরাঈল ৭৩-৭৫ আয়াত

আল্লাহ অন্যত্র বলেছেন, "তিনি যদি আমার নামে কোন কথা রচনা করে চালাতে চেষ্টা করতেন, আমি অবশ্যই ডান হাতে ধরে ফেলতাম, এবং কেটে দিতাম তার জীবন-ধমনী।" [সূরা আলহাক্কাহঃ ৪৪-৪৬]

ইসলামে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি আনুগত্য এবং নেক আমল (সৎকাজ) হলো আখিরাতে মুক্তি এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের মূল চাবিকাঠি। পবিত্র কুরআনে বিভিন্ন জায়গায় এর বিশেষ ফজিলত ও পুরস্কারের কথা ঘোষণা করা হয়েছে।নিচে এর মূল ফজিলত ও পুরস্কারগুলো সংক্ষেপে তুলে ধরা হলো:

১. দুনিয়া ও আখিরাতে দ্বিগুণ পুরস্কার

যেমনটি সূরা আল-আহযাবের **৩১** নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে, যারা পূর্ণ আনুগত্য ও নিষ্ঠার সাথে সৎকাজ করবে, আল্লাহ্ তাদের দ্বিগুণ পুরস্কার দেবেন। সাধারণ নেক আমলের চেয়ে আন্তরিকতা ও দায়িত্বশীলতার সাথে করা আমলের মর্যাদা আল্লাহর কাছে অনেক বেশি।

২. সম্মানজনক রিযিক (রিযকুন কারীম)

আল্লাহর অনুগত বান্দাদের জন্য দুনিয়াতে যেমন বরকতপূর্ণ জীবনের ব্যবস্থা থাকে, তেমনি আখিরাতে তাদের জন্য প্রস্তুত রয়েছে সম্মানজনক রিযিক। এর অর্থ হলো জান্নাতের এমন নেয়ামত, যা কোনোদিন শেষ হবে না এবং যা অত্যন্ত সম্মান ও মর্যাদার সাথে বিশ্বাসীদের দেওয়া হবে।

৩. মহান আল্লাহর ভালোবাসা ও ক্ষমা

কুরআনে বলা হয়েছে, "বলুন, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাসো, তবে আমার অনুসরণ করো; আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন এবং তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করে দেবেন।" (সূরা আল-ইমরান, আয়াত: ৩১)। অর্থাৎ, রাসূলের আনুগত্যের মাধ্যমেই আল্লাহর ভালোবাসা ও ক্ষমা নিশ্চিত হয়।

৪. চিরস্থায়ী জান্নাত এবং সর্বোত্তম সঙ্গী

যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অনুগত হবে, তারা পরকালে নবী, সত্যবাদী, শহীদ ও সৎকর্মশীলদের সঙ্গী হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করবে। এটিই মানুষের জন্য সবচেয়ে বড় সাফল্য। "আর যারা আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করে, তারা তাদের সঙ্গী হবে যাদের প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন—অর্থাৎ নবী, সত্যনিষ্ঠ, শহীদ ও সৎকর্মশীলগণ। আর সঙ্গী হিসেবে তারা কতই না উত্তম!" (সূরা আন-নিসা, আয়াত: ৬৯)

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: "আমার উম্মতের প্রত্যেকেই জান্নাতে প্রবেশ করবে, তবে সে ব্যক্তি ছাড়া যে অস্বীকার করেছে।" সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, "হে আল্লাহর রাসূল! কে অস্বীকার করেছে?" তিনি বললেন, "যে আমার আনুগত্য করল সে জান্নাতে প্রবেশ করল, আর যে আমার অবাধ্য হলো সে-ই (জান্নাতে যেতে) অস্বীকার করল।" (সহীহ বুখারী, হাদীস নং: ৭২৮০)

৫. মনের শান্তি ও পবিত্র জীবন (হায়াতান তাইয়্যিবাহ)

দুনিয়াতে সৎকর্মশীল মুমিনদের আল্লাহ একটি পবিত্র ও শান্তিপূর্ণ জীবন দান করেন। মানসিক প্রশান্তি ও আল্লাহর প্রতি অবিচল আস্থা কেবল আনুগত্যের মাধ্যমেই অর্জন করা সম্ভব। "মুমিন হয়ে পুরুষ কিংবা নারীর মধ্যে যে কেউ সৎকাজ করবে, তাকে আমরা অবশ্যই এক পবিত্র জীবন দান করব এবং তাদের তাদের কৃতকর্মের চেয়েও উত্তম পুরস্কার দেব।" (সূরা আন-নাহল, আয়াত: ৯৭)

يٰنِسَآءَ النَّبِىِّ لَسۡتُنَّ كَاَحَدٍ مِّنَ النِّسَآءِ اِنِ اتَّقَيۡتُنَّ فَلَا تَخۡضَعۡنَ بِالۡقَوۡلِ فَيَطۡمَعَ ৩৩ : ৩২
الَّذِىۡ فِىۡ قَلۡبِهٖ مَرَضٌ وَّ قُلۡنَ قَوۡلًا مَّعۡرُوۡفًا

৩২. হে নবী-পত্নিগণ! তোমরা অন্য নারীদের মত নও; যদি তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর সুতরাং পর-পুরুষের সাথে কোমল কণ্ঠে এমনভাবে কথা বলো না, কারণ এতে যার অন্তরে ব্যাধি আছে, সে প্রলুব্ধ হয় এবং তোমরা ন্যায়সংগত কথা বলবে।

এখান থেকে শেষ প্যারা পর্যন্ত আয়াতগুলোর মাধ্যমে ইসলামে পর্দা সংক্রান্ত বিধানের সূচনা করা হয়েছে। এ আয়াতগুলোতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রীদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে। কিন্তু এখানে উদ্দেশ্য হচ্ছে সমস্ত মুসলিম পরিবারে এ সংশোধনীগুলো প্রবর্তন করা।

নবীর পবিত্র স্ত্রীগণকে সম্বোধন করার একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে এই যে, যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের গৃহ থেকে এ পবিত্র জীবন ধারার সূচনা হবে তখন অন্যান্য সকল মুসলিম গৃহের মহিলারা আপনা আপনিই এর অনুসরণ করতে থাকবে। কারণ এ গৃহটিই তাদের জন্য আদর্শ ছিল।

এ আয়াতগুলোতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রীদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে কেবলমাত্র এরই ভিত্তিতে কেউ কেউ দাবী করে বসেছেন যে, এ বিধানগুলো কেবলমাত্র তাঁদের সাথেই সংশ্লিষ্ট। কিন্তু সামনের দিকে এ আয়াতগুলোতে যা কিছু বলা হয়েছে তা পাঠ করে দেখুন। এর মধ্যে কোন্ টি এমন যা শুধুমাত্র নবীর ﷺ পবিত্র স্ত্রীদের সাথে সংশ্লিষ্ট এবং বাকি মুসলমান নারীদের জন্য কাংখিত নয়? কেবলমাত্র নবীর স্ত্রীগণই আবর্জনামুক্ত নিষ্কলুষ জীবন যাপন করবেন, তাঁরাই আল্লাহ ও রসূলের আনুগত্য করবেন, নামায তাঁরাই পড়বেন এবং যাকাত তাঁরাই দেবেন, আল্লাহর উদ্দেশ্য কি এটাই হতে পারতো? যদি এ উদ্দেশ্য হওয়া সম্ভব না হতো, তাহলে গৃহকোণে নিশ্চিন্তে বসে থাকা, জাহেলী সাজসজ্জা থেকে দূরে থাকা এবং ভিন্ন পুরুষদের সাথে মৃদুস্বরে কথা বলার হুকুম একমাত্র তাদের সাথে সংশ্লিষ্ট এবং অন্যান্য সমস্ত মুসলিম নারীরা তা থেকে আলাদা হতে পারে কেমন করে?

একই কথার ধারাবাহিকতায় বিধৃত সামগ্রিক বিধানের মধ্য থেকে কিছু বিধিকে বিশেষ শ্রেণীর মানুষের জন্য নির্দিষ্ট ও কিছু বিধিকে সর্বসাধারণের পালনীয় গণ্য করার পেছনে কোন ন্যায়সঙ্গত যুক্তি আছে কি? আর "তোমরা সাধারণ নারীদের মতো নও" এ বাক্যটি থেকেও এ অর্থ বুঝায় না যে, সাধারণ নারীদের সাজসজ্জা করে বাইরে বের হওয়া এবং ভিন্ন পুরুষদের সাথে খুব ঢলাঢলি করে কথাবার্তা বলা উচিত। বরং এ কথাটা কিছুটা এমনি ধরনের যেমন এক ভদ্রলোক নিজের সন্তানদেরকে বলে, "তোমরা বাজারের ছেলেমেয়েদের মত নও। তোমাদের গালাগালি না করা উচিত।" এ থেকে কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি ও বক্তা এ উদ্দেশ্য আবিষ্কার করবে না যে, সে কেবলমাত্র নিজের ছেলেমেয়েদের জন্য গালি দেয়াকে খারাপ মনে করে, অন্য ছেলেমেয়েদের মধ্যে এ দোষ থাকলে তাতে তার কোন আপত্তি নেই।

আল্লাহ তাআলা যেরূপভাবে নারী জাতির দেহ-বৈচিত্রে পুরুষের জন্য যৌন আকর্ষণ সৃষ্টি করেছেন (যা থেকে হেফাযতের বিশেষ নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যাতে নারী পুরুষের জন্য ফেতনার কারণ না হয়ে পড়ে।) অনুরূপভাবে তিনি নারীদের কণ্ঠস্বরেও প্রকৃতিগতভাবে মন কেড়ে নেওয়ার ক্ষমতা, কোমলতা ও মধুরতা রেখেছেন, যা পুরুষকে নিজের দিকে আকর্ষণ করতে থাকে। সুতরাং সেই কণ্ঠস্বর ব্যবহার করার ব্যাপারেও এই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, পরপুরুষের সাথে বাক্যালাপের সময় ইচ্ছাপূর্বক এমন কণ্ঠ ব্যবহার করবে, যাতে

কোমলতা ও মধুরতার পরিবর্তে সামান্য শক্ত ও কঠোরতা থাকে। যাতে ব্যাধিগ্রস্ত অন্তরবিশিষ্ট লোক কণ্ঠের কোমলতার কারণে তোমাদের দিকে আকৃষ্ট না হয়ে পড়ে এবং তাদের মনে কুবাসনার সঞ্চার না হয়।

অর্থাৎ, এই কর্কশতা ও কঠোরতা শুধু কণ্ঠস্বরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে, অর্থাৎ মুখে এমন বাক্য আনবে না, যা অসঙ্গত ও সচ্চরিত্রতার পরিপন্থী। إِنِ اتَّقَيْتُنَّ (যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় কর) বলে আল্লাহ তাআলা ইঙ্গিত করেছেন যে, এই কথা এবং অন্যান্য নির্দেশাবলী যা সামনে বর্ণনা করা হবে, তা মুত্তাকী নারীদের জন্য (যারা আল্লাহকে ভয় করে)। কারণ তাদেরই আশঙ্কা থাকে যে, যাতে তাদের আখেরাত বরবাদ না হয়ে যায়। পক্ষান্তরে যাদের হৃদয় আল্লাহর ভয়শূন্য তাদের সাথে এই নির্দেশাবলীর কোন সম্পর্ক নেই। তারা কখনোও এর পরোয়া করবে না।

লক্ষণীয় বিষয় হল, কন্ঠস্বরের কোমলতা পরিহারের নির্দেশ সরাসরি নবীযুগের নারীদেরকে দেয়া হয়েছে।

সুতরাং আমাদের যুগের মহিলাদের আরো বেশি সতর্ক থাকতে হবে। কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে,

إِنَّ السَّمْعَ وَالبَصَرَ وَالفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا.

...নিশ্চয় কান, চোখ, হৃদয় এর প্রতিটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। সূরা বনী ইসরাঈল : ৩৬
হযরত আবূ হুরায়রা রাঃ থেকে বর্ণিত।

فَالْعَيْنَانِ زِنَاهُمَا النَّظَرُ، وَالْأُذُنَانِ زِنَاهُمَا الِاسْتِمَاعُ، وَاللِّسَانُ زِنَاهُ الْكَلَامُ، وَالْيَدُزِنَاهَا الْبَطْشُ، وَالرِّجْلُ زِنَاهَا الْخُطَا، وَالْقَلْبُ يَهْوَى وَيَتَمَنَّى، وَيُصَدِّقُ ذَلِكَ الْفَرْجُ وَيُكَذِّبُهُ

রাসূল সাঃ ইরশাদ করেন, চোখের জিনা হল [হারাম] দৃষ্টিপাত। কর্ণদ্বয়ের জিনা হল, [গায়রে মাহরামের যৌন উদ্দীপক] কথাবার্তা মনযোগ দিয়ে শোনা। জিহবার জিনা হল, [গায়রে মাহরামের সাথে সুড়সুড়িমূলক] কথোপকথন। হাতের জিনা হল, [গায়রে মাহরামকে] ধরা বা স্পর্শকরণ। পায়ের জিনা হল, [খারাপ উদ্দেশ্যে] চলা। অন্তর চায় এবং কামনা করে আর লজ্জাস্থান তাকে বাস্তবে রূপ দেয় [যদি জিনা করে] এবং মিথ্যা পরিণত করে [যদি অন্তরের চাওয়া অনুপাতে জিনা না করে]। {সহীহ মুসলিম, হাদীস নং-২৬৫৭, মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং-৮৯৩২}

ফাতাওয়ায়ে মাহমুদিয়্যাহ;১৯/১৯৩ এ নারীদের আওয়াজ সতরের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার (মারজুহ) রেওয়াতকে বর্তমান প্রেক্ষাপটে অগ্রাধিকার দিয়ে বলা হয়েছে যে,পর-পুরুষের সামনে মহিলা বক্তৃতা দিতে পারবে না।বক্তৃতা প্রদান জায়েয হবে না।

প্রয়োজন হলে কোন পুরুষের সাথে কথা বলতে বাধা নেই কিন্তু এ সময় নারীর কথা বলার ভংগী ও ধরন এমন হতে হবে যাতে আলাপকারী পুরুষের মনে কখনো এ ধরনের কোন চিন্তার উদয় না হয় যে, এ নারীটির ব্যাপারে অন্য কিছু আশা করা যেতে পারে। তার বলার ভংগীতে কোন নমনীয়তা থাকবে না। তার কথায় কোন মনমাতানো ভাব থাকবে না। সে সজ্ঞানে তার স্বরে মাধুর্য সৃষ্টি করবে না, যা শ্রবণকারী পুরুষের আবেগকে উদ্বেলিত করে তাকে সামনে পা বাড়াবার প্ররোচনা দেবে ও সাহস যোগাবে। এ ধরনের কথাবার্তা সম্পর্কে আল্লাহ পরিষ্কার বলেন, এমন কোন নারীর পক্ষে এটা শোভনীয় নয়, যার মনে আল্লাহ ভীতি ও অসৎকাজ

থেকে দূরে থাকার প্রবণতা রয়েছে। অন্যকথায় বলা যায়, এটা দুশ্চরিত্রা ও বেহায়া নারীদের কথা বলার ধরন, মু’মিন ও মুত্তাকী নারীদের নয়।

এই সাথে সূরা নূরের নিম্নোক্ত আয়াতটিও সামনে রাখা দরকার وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ (আর তারা যেন যমীনের ওপর এমনভাবে পদাঘাত করে না চলে যার ফলে যে সৌন্দর্য তারা লুকিয়ে রেখেছে তা লোকদের গোচরীভূত হয়।) এ থেকে মনে হয় বিশ্ব-জাহানের রবের পরিষ্কার উদ্দেশ্য হচ্ছে এই যে, নারীরা যেন অযথা নিজেদের স্বর ও অলংকারের ধ্বনি অন্য পুরুষদেরকে না শোনায় এবং যদি প্রয়োজনে অপরিচিতদের সাথে কথা বলতে হয়, তাহলে পূর্ণ সতর্কতা সহকারে বলতে হবে। এজন্য নারীদের আযান দেয়া নিষেধ। তাছাড়া জামায়াতের নামাযে যদি কোন নারী হাজির থাকে এবং ইমাম কোন ভুল করেন তাহলে পুরুষের মতো তার সুবহানাল্লাহ বলার অনুমতি নেই, তার কেবলমাত্র হাতের ওপর হাত মেরে আওয়াজ সৃষ্টি করতে হবে যাতে ইমাম সতর্ক হয়ে যান।

এখন চিন্তার বিষয় হচ্ছে যে, দ্বীন নারীকে ভিন্ পুরুষের সাথে কোমল স্বরে কথা বলার অনুমতি দেয় না এবং পুরুষদের সাথে অপ্রয়োজনে কথা বলতেও তাদেরকে নিষেধ করে, সে কি কখনো নারীর মঞ্চে এসে নাচগান করা, বাজনা বাজানো ও রঙ্গরস করা পছন্দ করতে পারে? সে কি রেডিও-টেলিভিশনে নারীদের প্রেমের গান গেয়ে এবং সুমিষ্ট স্বরে অশ্লিল রচনা শুনিয়ে লোকদের আবেগকে উত্তেজিত করার অনুমতি দিতে পারে? নারীরা নাটকে কখনো কারো স্ত্রীর এবং কখনো কারো প্রেমিকার অভিনয় করবে, এটাকে কি সে বৈধ করতে পারে? অথবা তাদেরকে বিমানবালা (Air-hostess) করা হবে এবং বিশষভাবে যাত্রীদের মন ভোলাবার প্রশিক্ষণ দেয়া হবে, কিংবা ক্লাবে, সামাজিক উৎসবে ও নারী-পুরুষের মিশ্র অনুষ্ঠানে তারা চমকপ্রদ সাজ-সজ্জা করে আসবে এবং পুরুষদের সাথে অবাধে মিলেমিশে কথাবার্তা ও ঠাট্টা-তামাসা করবে, এসবকে কি সে বৈধ বলবে? এ সংস্কৃতি উদ্ভাবন করা হয়েছে কোন্ কুরআন থেকে? আল্লাহর নাযিল করা কুরআন তো সবার সামনে আছে। সেখানে কোথাও যদি এ সংস্কৃতির অবকাশ দেখা যায় তাহলে সেখানটা চিহ্নিত করা হোক।

৩৩ : ৩৩ وَ قَرْنَ فِيْ بُيُوْتِكُنَّ وَ لَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْاُوْلٰى وَ اَقِمْنَ الصَّلٰوةَ وَ اٰتِيْنَ الزَّكٰوةَ وَ اَطِعْنَ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ ؕ اِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيْرًا

৩৩. আর তোমরা নিজ ঘরে অবস্থান করবে এবং প্রাচীন জাহেলী যুগের প্রদর্শনীর মত নিজেদেরকে প্রদর্শন করে বেড়াবে না। আর তোমরা সালাত কায়েম কর, যাকাত প্ৰদান কর এবং আল্লাহ ও তার রাসূলের অনুগত থাক। হে নবী-পরিবার! আল্লাহ তো শুধু চান তোমাদের থেকে অপবিত্রতা দূর করতে এবং তোমাদেরকে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র করতে।

মূলে বলা হয়েছে قَرْنَ কোন কোন অভিধানবিদ একে قرار শব্দ থেকে গৃহীত বলে মত প্রকাশ করেন আবার কেউ কেউ বলেন وقار থেকে গৃহীত। যদি এটি قرار থেকে উদ্ভূত হয়, তাহলে এর অর্থ হবে “স্থিতিবান হও “টিকে থাকো।” আর যদি وقار থেকে উদ্ভূত হয়, তাহলে অর্থ হবে “শান্তিতে থাকো।” , “নিশ্চিন্তে ও স্থির হয়ে বসে উভয় অবস্থায় আয়াতের অর্থ দাঁড়ায়, নারীর আসল কর্মক্ষেত্র হচ্ছে তার গৃহ। এ বৃত্তের মধ্যে অবস্থান করে তাকে নিশ্চিন্তে নিজের দায়িত্ব সম্পাদন করে যেতে হবে। কেবলমাত্র প্রয়োজনের ক্ষেত্রে সে গৃহের বাইরে

বের হতে পারে। আয়াতের শব্দাবলী থেকেও এ অর্থ প্রকাশ হচ্ছে এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীস একে আরো বেশী সুস্পষ্ট করে দেয়। হাফেয আবু বকর বায্‌যার হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেনঃ নারীরা নবী করীমের ﷺ কাছে নিবেদন করলো যে, পুরুষরা তো সকল শ্রেষ্ঠ মর্যাদা লুটে নিয়ে গেলো। তারা জিহাদ করে এবং আল্লাহর পথে বড় বড় কাজ করে। মুজাহিদদের সমান প্রতিদান পাবার জন্য আমরা কি কাজ করবো? জবাবে বললেনঃ

مَنْ قَعَدَةْ مِنْكُنَّ فِى بَيْتِهَا فَاِنَّهَا تَدْرِكَ عَمَلَ الْمُجَاهِدِيْنِ-

"তোমাদের মধ্য থেকে যে গৃহমধ্যে বসে যাবে সে মুজাহিদদের মর্যাদা লাভ করবে।" অর্থাৎ মুজাহিদ তো তখনই স্থিরচিত্তে আল্লাহ পথে লড়াই করতে পারবে যখন নিজের ঘরের দিক থেকে সে পূর্ণ নিশ্চিন্ত থাকতে পারবে, তার স্ত্রী তার গৃহস্থালী ও সন্তানদেরকে আগলে রাখবে এবং তার অবর্তমানে তার স্ত্রী কোন অঘটন ঘটাবে না, এ ব্যাপারে সে পুরোপুরি আশঙ্কামুক্ত থাকবে। যে স্ত্রী তার স্বামীকে এ নিশ্চিন্ততা দান করবে সে ঘরে বসেও তার জিহাদে পুরোপুরি অংশীদার হবে।

অন্য একটি হাদীস বায্‌যার ও তিরমিযী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে উদ্ধৃত করেছেন। তাতে তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ উক্তি বর্ণনা করেছেনঃ

ان الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ فَإِذَا خَرَجَتِ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ وَاَقْرَبَ مَا تَكُوْنُ بِرَوْحَةٍ رَبِّهَا وَهِى فِى قَعْرِ بَيْتِهَا-

"নারী পর্দাবৃত থাকার জিনিস। যখন সে বের হয় শয়তান তার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখে এবং তখনই সে আল্লাহর রহমতের নিকটতর হয় যখন সে নিজের গৃহে অবস্থান করে।"

কুরআন মজীদের এ পরিষ্কার ও সুস্পষ্ট হুকুমের উপস্থিতিতে মুসলমান নারীদের জন্য অবকাশ কোথায় কাউন্সিল ও পার্লামেন্টে সদস্য হবার, ঘরের বাইরে সামাজিক কাজকর্মে দৌঁড়াদৌড়ি করার, সরকারী অফিসে পুরুষদের সাথে কাজ করা, কলেজে ছেলেদের সাথে শিক্ষালাভ করার, পুরুষদের হাসপাতলে নার্সিংয়ের দায়িত্ব সম্পাদন করার, বিমানে ও রেলগাড়িতে যাত্রীদের সেবা করার দায়িত্বে নিয়োজিত হবার এবং শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ লাভের জন্য তাদেরকে আমেরিকায় ও ইংল্যাণ্ড পাঠাবার? নারীদের ঘরের বাইরে গিয়ে কাজ করার বৈধতার সপক্ষে সবচেয়ে যে যুক্তি পেশ করা হয় সেটি হচ্ছে এই যে, হযরত আয়েশা (রা.) উষ্ট্র যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু এ যুক্তি যারা পেশ করেন তারা সম্ভবত এ ব্যাপারে স্বয়ং হযরত আয়েশার কি চিন্তা ছিল তা জানেন না। আবদুল্লাহ ইবনে আহমাদ ইবনে হাম্বল যাওয়ায়েদুয যাহদ এবং ইবনুল মুনযির, ইবনে আবী শাইবাহ ও ইবনে সা' দ তাঁদের কিতাবে মাসরূক থেকে হাদীস উদ্ধৃত করেছেন। তাতে বলা হয়েছে, হযরত আয়েশা (রা.) যখন কুরআন তেলাওয়াত করতে করতে এ আয়াতে পৌঁছতেন (وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ) তখন স্বতঃস্ফূর্তভাবে কেঁদে ফেলতেন, এমনকি তাঁর উড়না ভিজে যেতো। করণ এ প্রসঙ্গে উষ্ট্র যুদ্ধে গিয়ে তিনি যে ভুল করেছিলেন সে কথা তাঁর মনে পড়ে যেতো।

যে প্রেক্ষাপটে এ আয়াত নাযিল হয়েছে তা থেকে সুস্পষ্টভাবে জনা যায় যে, এখানে আহলে বায়েত বা নবী পরিবার বলতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রীদেরকে বুঝানো হয়েছে। কারণ সম্বোধনের সূচনা করা হয়েছে "হে নবীর স্ত্রীগণ!" বলে এবং সামনের ও পিছনের পুরো ভাষণ তাদেরকে সম্বোধন করেই ব্যক্ত

হয়েছে। এছাড়াও যে অর্থে আমরা “পরিবারবর্গ” শব্দটি বলি এ অর্থে একজন লোকের স্ত্রী ও সন্তানরা সবাই এর অন্তর্ভুক্ত হয় ঠিক সেই একই অর্থে আরবী ভাষায় “আহলুল বায়েত” শব্দটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। স্ত্রীকে বাদ দিয়ে “পরিবারবর্গ” শব্দটি কেউ ব্যবহার করে না। কুরআন মজীদেও এ জায়গা ছাড়াও আরো দু’ জায়গায় এ শব্দটি এসেছে এবং সে দু’ জায়গায়ও তার অর্থের মধ্যে স্ত্রী অন্তর্ভুক্তই শুধু নয়, অগ্রবর্তীও রয়েছে। সূরা হূদে যখন ফেরেশতারা হযরত ইবরাহীমকে (আ) পুত্র সন্তান লাভের সুসংবাদ দেন তখন তাঁর স্ত্রী তা শুনে বিস্ময় প্রকাশ করেন এই বলে যে, এ বুড়ো বয়সে আমাদের আবার ছেলে হবে কেমন করে! একথায় ফেরেশতারা বলেনঃ

أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ رَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ

“তোমরা কি আল্লাহর কাজে অবাক হচ্ছো? হে এ পরিবারের লোকেরা! তোমাদের প্রতি তো আল্লাহর রহমত ও তাঁর বরকত রয়েছে।”

সূরা কাসাসে যখন হযরত মূসা (আ) একটি দুগ্ধপোষ্য শিশু হিসেবে ফেরাউনের গৃহে পৌঁছে যান এবং ফেরাউনের স্ত্রী এমন কোন ধাত্রীর সন্ধান করতে থাকেন যার দুধ এ শিশু পান করবে তখন হযরত মূসার বোন গিয়ে বলেন

هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُم

“আমি কি তোমাদের এমন পরিবারের খবর দেবো যারা তোমাদের জন্য এ শিশুর লালন-পালনের দায়িত্ব নেবেন?”

কাজেই ভাষার প্রচলিত কথ্যরীতি, কুরআনের বর্ণনাভংগী এবং খোদ এ আয়াতটির পূর্বাপর আলোচ্য বিষয় সবকিছুই চূড়ান্তভাবে প্রমাণ করে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আহলি বায়েতের মধ্যে তাঁর পবিত্র স্ত্রীগণও আছেন এবং তাঁর সন্তানরাও আছেন। বরং বেশী নির্ভুল কথা হচ্ছে এই যে, আয়াতে মূলত সম্বোধন করা হয়েছে তাঁর স্ত্রীগণকেই এবং সন্তানরা এর অন্তর্ভুক্ত গণ্য হয়েছেন শব্দের অর্থের প্রেক্ষিতে। এ কারণে ইবনে আব্বাস (রা.), উরওয়া ইবনে যুবাইর (রা.) এবং ইকরামাহ বলেন, এ আয়াতে আহলে বায়েত বলতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রীদেরকেই বুঝানো হয়েছে।

কিন্তু কেউ যদি বলেন, ‘আহলুল বায়েত” শব্দ শুধুমাত্র স্ত্রীদের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে, অন্য কেউ এর মধ্যে প্রবেশ করতে পারে না, তাহলে একথাও ভুল হবে। “পরিবারবর্গ” শব্দের মধ্যে মানুষের সকল সন্তান-সন্ততি কেবল শামিল হয় তাই নয় বরং নবী ﷺ নিজে সুস্পষ্টভাবে তাদের শামিল হবার কথা বলেছেন। ইবনে আবি হাতেম বর্ণনা করেছেন, হযরত আয়েশাকে (রা.) একবার হযরত আলী (রা.) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়। জবাবে তিনি বলেনঃ

تَسْأَلُنِىْ عَنْ رَجُلٍ كَانَ مِنْ اَحَبَّ النَّاسِ اِلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَتْ تَحْتَهُ ابْنَتَهُ وَاَحَبُّ النَّاسِ اِلَيْهِ-

"তুমি আমাকে এমন ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছো যিনি ছিলেন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রিয়তম লোকদের অন্তর্ভুক্ত এবং যার স্ত্রী ছিলেন রসূলের এমন মেয়ে যাকে তিনি মানুষদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী ভালোবাসতেন।" তারপর হযরত আয়েশা (রা.) এ ঘটনা শুনানঃ নবী করীম ﷺ হযরত আলী ও ফাতেমা এবং হাসান ও হোসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুমকে ডাকলেন এবং তাঁদের উপর একটা কাপড় ছড়িয়ে দিলেন এবং দোয়া করলেনঃ

اللَّهُمَّ هَؤُلَاءِ أَهْلُ بَيْتِى فَأَذْهِبْ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهِّرْهُمْ تَطْهِيرًا

"হে আল্লাহ এরা আমার আহলে বায়েত (পরিবারবর্গ), এদের থেকে নাপাকি দূর করে দাও এবং এদেরকে পাক-পবিত্র করে দাও।"

হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, আমি নিবেদন করলাম, আমিও তো আপনার আহলে বায়েতের অন্তর্ভুক্ত (অর্থাৎ আমাকেও এ কাপড়ের নীচে নিয়ে আমার জন্যও দোয়া করুন) নবী করীম ﷺ বলেন, "তুমি আলাদা থাকো, তুমি তো অন্তর্ভুক্ত আছোই।" প্রায় একই ধরনের বক্তব্য সম্বলিত বহু সংখ্যক হাদীস মুসলিম, তিরমিযী, আহমাদ, ইবনে জারীর, হাকেম, বায়হাকি প্রমুখ মুহাদ্দিসগণ আবু সাঈদ খুদরী (রা.), হযরত আয়েশা (রা.), হযরত আনাস (রা.), হযরত উম্মে সালামাহ (রা.), হযরত ওয়াসিলাহ ইবন আসকা' এবং অন্যান্য কতিপয় সাহাবা থেকে বর্ণনা করেছেন। সেগুলো থেকে জানা যায়, নবী ﷺ হযরত আলী (রা.), ফাতেমা (রা.) এবং তাদের দু' টি সন্তানকে নিজের আহলে বায়েত গণ্য করেন। কাজেই যাঁরা তাঁদেরকে আহলে বায়েতের বাইরে মনে করেন তাদের চিন্তা ভুল।

অনুরূপভাবে যার উপরোক্ত হাদীসগুলোর ভিত্তিতে রসূলের পবিত্র স্ত্রীগণকে আহলে বায়েতের বাইরে গণ্য করেন তাদের মতও সঠিক নয়। প্রথমত যে বিষয়টি সরাসরি কুরআন থেকে প্রমাণিত, তাকে কোন হাদীসের ভিত্তিতে প্রত্যাখ্যান করা যেতে পারে না। দ্বিতীয়ত সংশ্লিষ্ট হাদীসগুলোর অর্থও তা নয় যা সেগুলো থেকে গ্রহণ করা হচ্ছে। এগুলোর কোন কোনটিতে এই যে কথা এসেছে যে, হযরত আয়েশা (রা.) ও হযরত উম্মে সালামাকে (রা.) নবী ﷺ সেই চাদরের নীচে নেননি যার মধ্যে হযরত আলী, ফতেমা, হাসান ও হোসাইনকে নিয়েছিলেন, এর অর্থ এ নয় যে, তিনি তাঁদেরকে নিজের "পরিবারের" বাইরে গণ্য করেছিলেন। বরং এর অর্থ হচ্ছে, স্ত্রীগণ তো পরিবারের অন্তর্গত ছিলেনই। কারণ কুরআন তাঁদেরকেই সম্বোধন করেছিল। কিন্তু নবী করীমের ﷺআশঙ্কা হলো, এ চারজন সম্পর্কে কুরআনের বাহ্যিক অর্থের দিক দিয়ে কারো যেন ভুল ধারণা না হয়ে যায় যে, তাঁরা আহলে বায়েতের বাইরে আছেন, তাই তিনি পবিত্র স্ত্রীগণের পক্ষে নয়, তাঁদের পক্ষে ব্যাপারটি সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করার প্রয়োজন অনুভব করেন।

একটি দল এ আয়াতের ব্যাখ্যায় শুধুমাত্র এতটুকু বাড়াবাড়ি করেই ক্ষান্ত থাকেননি যে, পবিত্র স্ত্রীগণকে আহলে বায়েত থেকে বের করে দিয়ে কেবলমাত্র হযরত আলী (রা.), ফাতেমা (রা.) ও তাঁদের দু' টি সন্তানকে এর মধ্যে শামিল করেছেন বরং এর ওপর এভাবে আরো বাড়াবাড়ি করেছেন যে, "আল্লাহ তো চান তোমাদের থেকে ময়লা দূর করে তোমাদের কে পুরোপুরি পবিত্র করে দিতে" কুরআনের এ শব্দগুলো থেকে এ সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, হযরত আলী, ফাতেমা এবং তাঁদের সন্তান-সন্ততি আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামগণের মতোই মাসূম তথা গোনাহমুক্ত নিষ্পাপ। তাদের বক্তব্য হচ্ছে, "ময়লা" অর্থ ভ্রান্তি ও গোনাহ এবং আল্লাহর উক্তি

অনুযায়ী আহলে বায়েতকে এগুলো থেকে মুক্ত করে দেয়া হয়েছে। অথচ আয়াতে একথা বলা হয়নি যে, তোমাদের থেকে ময়লা দূর করে দেয়া হয়েছে এবং তোমাদেরকে পাক-পবিত্র করা হয়েছে।

বরং বলা হয়েছে, আল্লাহ তোমাদের থেকে ময়লা দূর করতে এবং তোমাদের পুরোপুরি পাক পবিত্র করতে চান। পূর্বাপর আলোচনাও এখানে আহলে বায়েতের মর্যাদা বর্ণনা করাই উদ্দেশ্য একথা বলে না। বরং এখানে তো আহলে বায়েতকে এ মর্মে নসিহত করা হয়েছে, তোমরা অমুক কাজ করো এবং অমুক কাজ করো না কারণ আল্লাহ তোমাদের পাক পবিত্র করতে চান। অন্য কথায় এর অর্থ হচ্ছে, তোমরা অমুক নীতি অবলম্বন করলে পবিত্রতার নিয়ামতে সমৃদ্ধ হবে অন্যথায় তা লাভ করতে পারবে না। তবুও যদি يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ ....وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا এর অর্থ এ নেয়া হয় যে, আল্লাহ তাঁদেরকে নিষ্পাপ করে দিয়েছেন, তাহলে অযু, গোসল ও তায়াম্মুমকারী প্রত্যেক মুসলমানকে নিষ্পাপ বলে মেনে না নেয়ার কোন কারণ নেই। কারণ তাদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেছেনঃ

وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ

"কিন্তু আল্লাহ চান তোমাদেরকে পাক-পবিত্র করে দিতে এবং তাঁর নিয়ামত তোমাদের উপর পূর্ণ করে দিতে।" (আল মা-য়েদাহ, ৬)

এ আয়াতে দু' টি গুরুত্বপূর্ণ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। আয়াতের অর্থ অনুধাবন করার জন্য এ দু' টি বুঝে নেয়া জরুরী। এর একটি হচ্ছে "তাবাররুজ" এবং দ্বিতীয়টি "জাহেলিয়াত।"

আরবী ভাষায় 'তাবাররুজ" মানে হচ্ছে উন্মুক্ত হওয়া, প্রকাশ হওয়া এবং সুস্পষ্ট হয়ে সামনে এসে যাওয়া। দূর থেকে দেখা যায় এমন প্রত্যেক উঁচু ভবনকে আরবরা "বুরুজ" বলে থাকে। দুর্গ বা প্রাসাদের বাইরের অংশের উচ্চ কক্ষকে এ জন্যই বুরুজ বলা হয়ে থাকে। পালতোলা নৌকার পাল দূর থেকে দেখা যায় বলে তাকে "বারজা" বলা হয়,

নারীর জন্য তাবাররুজ শব্দ ব্যবহার করা হলে তার তিনটি অর্থ হবে।

এক, সে তার চেহারা ও দেহের সৌন্দর্য লোকদের দেখায়।

দুই, সে তার পোশাক ও অলংকারের বহর লোকদের সামনে উন্মুক্ত করে।

তিন, সে তার চাল-চলন ও চমক-ঠমকের মাধ্যমে নিজেকে অন্যদের সামনে তুলে ধরে।

অভিধান ও তাফসীর বিশারদগণ এ শব্দটির এ ব্যাখ্যাই করেছেন। মুজাহিদ, কাতাদাহ ও ইবনে আবি নুজাইহ বলেন, التبرج المشى بتبخر وتكسر وتغنج- "তাবাররুজের অর্থ হচ্ছে, গর্ব ও মনোরম অংগভংগী সহকারে হেলেদুলে ও সাড়ম্বরে চলা।"

মুকাতিল বলেন, ابداء قلائدها وقرطها وعنقها "নিজের হার, ঘাড় ও গলা সুস্পষ্ট করা।"

আল মুবাররাদের উক্তি হচ্ছেঃ ان تبدى من مناسنها مايجب عليها ستره "নারীর এমন গুণাবলী প্রকাশ করা যেগুলো তার গোপন রাখা উচিত।" আবু উবাইদাহর ব্যাখ্যা হচ্ছেঃ

ان تخرج من محاسنها ماتستدهى به شهوة الرجال

"নারীর শরীর ও পোশাকের সৌন্দর্য এমনভাবে উন্মুক্ত করা যার ফলে পুরুষেরা তার প্রতি আকৃষ্ট হয়।"

জাহেলিয়াত শব্দটি কুরআন মজিদের এ জায়গা ছাড়াও আরো তিন জায়গায় ব্যবহার করা হয়েছে।

এক, আলে ইমরানের ১৫৪ আয়াত। সেখানে আল্লাহর পথে যুদ্ধ করার ক্ষেত্রে যারা গা বাঁচিয়ে চলে তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে, তারা "আল্লাহ সম্পর্কে সত্যের বিরুদ্ধে জাহেলিয়াতের মতো ধারণা পোষণ করে।"

দুই, সূরা মা-য়েদাহর ৫০ আয়াতে। সেখানে আল্লাহর আইনের পরিবর্তে অন্য কারোর আইন অনুযায়ী ফায়সালাকারীদের সম্পর্কে বলা হয়েছে, "তারা কি জাহেলিয়াতের ফায়সালা চায়? "

তিন, সূরা ফাতহের ২৬ আয়াতে সেখানে মক্কার কাফেররা নিছক বিদ্বেষ বশত মুসলমানদের উমরাহ করতে দেয়নি বলে তাদের এ কাজকেও "জাহেলী স্বার্থান্ধতা ও জিদ" বলা হয়েছে।

হাদীসে বলা হয়েছে, একবার হযরত আবু দারদা করো সাথে ঝগড়ায় লিপ্ত হয়ে তার মাকে গালি দেন। রসূলুল্লাহ ﷺ তা শুনে বলেন, "তোমার মধ্যে এখনো জাহেলিয়াত রয়ে গেছে।"

অন্য একটি হাদীসে রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "তিনটি কাজ জাহেলিয়াতের অন্তর্ভুক্ত। অন্যের বংশের খোটা দেয়া, নক্ষত্রের আবর্তন থেকে ভাগ্য নির্ণয় করা এবং মৃতদের জন্য সুর করে কান্নাকাটি করা।" শব্দটির এ সমস্ত প্রয়োগ থেকে একথা সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, জাহেলিয়াত বলতে ইসলামী পরিভাষায় এমন প্রত্যেকটি কার্যধারা বুঝায় যা ইসলামী কৃষ্টি ও সংস্কৃতি, ইসলামী শিষ্টাচার ও নৈতিকতা এবং ইসলামী মানসিকতার বিরোধী। আর প্রথম যুগের জাহেলিয়াত বলতে এমন অসৎকর্ম বুঝায় যার মধ্যে প্রাগৈসলামিক আরবরা এবং দুনিয়ার অন্যান্য সমস্ত লোকেরা লিপ্ত ছিল।

এ ব্যাখ্যা থেকে একথা সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, আল্লাহ নারীদেরকে যে কার্যধারা থেকে বিরত রাখতে চান তা হচ্ছে,

- তাদের নিজেদের সৌন্দর্যের প্রদর্শনী করে গৃহ থেকে বের হওয়া। তিনি তাদের আদেশ দেন, নিজেদের গৃহে অবস্থান করো। কারণ, তোমাদের আসল কাজ রয়েছে গৃহে, বাইরে নয়।
- কিন্তু যদি বাইরে বের হবার প্রয়োজন হয়, তাহলে এমনভাবে বের হয়ো না যেমন জাহেলী যুগে নারীরা বের হতো। প্রসাধন ও সাজ-সজ্জা করে, সুশোভন অলংকার ও আঁটসাঁট বা হালকা মিহিন পোষাকে সজ্জিত হয়ে চেহারা ও দেহের সৌন্দর্যকে উন্মুক্ত করে এবং গর্ব ও আড়ম্বরের সাথে চলা কোন মুসলিম সমাজের নারীদের কাজ নয়। এগুলো জাহেলিয়াতের রীতিনীতি। ইসলামে এসব চলতে পারে না। এখন প্রত্যেক ব্যক্তি নিজেই দেখতে পারেন আমাদের দেশে যে সংস্কৃতির প্রচলন করা হচ্ছে তা কুরআনের দৃষ্টিতে ইসলামের সংস্কৃতি না জাহেলিয়াতের সংস্কৃতি?

وَ اذۡکُرۡنَ مَا یُتۡلٰی فِیۡ بُیُوۡتِکُنَّ مِنۡ اٰیٰتِ اللّٰهِ وَ الۡحِکۡمَۃِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ کَانَ لَطِیۡفًا ৩৪ : ৩৩
خَبِیۡرًا

৩৪. আর আল্লাহর আয়াত ও হিকমত থেকে যা তোমাদের ঘরে পাঠ করা হয়, তা তোমরা স্মরণ রাখবে; নিশ্চয় আল্লাহ্ অতি সুক্ষ্মদর্শী, সম্যক অবহিত।

মূলে وَاذْكُرْنَ শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। এর দু'টি অর্থ: 'স্মরণ রেখো' এবং 'বর্ণনা করো'।

স্মরণ রেখো' --- প্রথম অর্থের দৃষ্টিতে এর তাৎপর্য এই দাঁড়ায়:

হে নবীর স্ত্রীগণ! তোমরা কখনো ভুলে যেয়ো না যে, যেখান থেকে সারা দুনিয়াকে আল্লাহর আয়াত, জ্ঞান ও প্রজ্ঞার শিক্ষা দেয়া হয় সেটিই তোমাদের আসল গৃহ। তাই তোমাদের দায়িত্ব বড়ই কঠিন। তোমাদের গৃহে যেসব বিষয় আলোচনা হয় সেসব বিষয় স্বয়ং স্মরণ রেখো —যার ফলশ্রুতি ও পরিচয় হলো এগুলোর উপর আমল করা।

বর্ণনা করো-----দ্বিতীয় অর্থটির দৃষ্টিতে এর তাৎপর্য হয়:

হে নবীর স্ত্রীগণ! তোমরা যা কিছু শোনো এবং দেখো তা লোকদের সামনে বর্ণনা করতে থাকো। কারণ রাসূলের সাথে সার্বক্ষণিক অবস্থানের কারণে এমন অনেক বিধান তোমাদের গোচরীভূত হবে যা তোমাদের ছাড়া অন্য কোন মাধ্যমে লোকদের জানা সম্ভব হবে না। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে যেসব শিক্ষা প্রদান করেছেন, উম্মতের অন্যান্য লোকদের সঙ্গে সেসবের আলোচনা করা এবং তাদেরকে সেগুলো পৌছে দেয়া তাদের দায়িত্ব।

এ আয়াতে দু'টি জিনিসের কথা বলা হয়েছে।

এক, আল্লাহর আয়াত,

দুই, হিকমাত বা জ্ঞান ও প্রজ্ঞা।

আল্লাহর আয়াত অর্থ হচ্ছে, আল্লাহর কিতাবের আয়াত।

কিন্তু হিকমাত শব্দটি অত্যন্ত ব্যাপক অর্থবোধক। সকল প্রকার জ্ঞানের কথা এর অন্তর্ভুক্ত, যেগুলো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম লোকদেরকে শেখাতেন। হিকমাত (আরবী: حكمة) বা হিকমত হলো প্রজ্ঞা, সঠিক জ্ঞান এবং কোনো কিছু নিখুঁতভাবে ও যথাযথ স্থানে প্রয়োগ করার বিশেষ ক্ষমতা।

আল্লাহর কিতাবের শিক্ষার ওপরও এ শব্দটি প্রযোজ্য হতে পারে। কিন্তু কেবলমাত্র তার মধ্যেই একে সীমিত করে দেবার সপক্ষে কোন প্রমাণ নেই। কুরআনের আয়াত শুনানো ছাড়াও নবী সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের পবিত্র জীবন ও নৈতিক চরিত্র এবং নিজের কথার মাধ্যমে যে হিকমাতের শিক্ষা দিতেন তাও অপরিহার্যভাবে এর অন্তর্ভুক্ত। [দেখুন: তাবারী, ফাতহুল কাদীর; কুরতুবী]

হিকমাহ কী? এবং ইসলামী সফলতার ধারাবাহিক শর্ত

আরবীতে হিকমাহ হলো – উপকারী জ্ঞান এবং এর উপর কাজ করা।

হিকমাহ অর্থাৎ প্রজ্ঞা এসেছে ইহ্‌কাম احكم থেকে, যার অর্থ কথা বা কাজে পরিপূর্ণতা, পারফেকশন। প্রজ্ঞা হচ্ছে জ্ঞানকে সঠিকভাবে ব্যবহার। আমাদের অনেক জ্ঞান থাকতে পারে, কিন্তু যদি প্রজ্ঞা না থাকে, তাহলে সেই জ্ঞানের সঠিক ব্যবহার হবে না। যেমন: আমরা অনেকেই জানি, আল্লাহ تعالى আমাদের ক্বদর/ভাগ্যের মালিক, তিনি সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করেন। এই ব্যাপারে কুর’ আনের আয়াতগুলো আমরা পড়েছি, আমাদের জ্ঞান যথেষ্টই আছে। কিন্তু তারপরও আমরা বাচ্চার কপালে কালো টিপ দেই, যেন অশুভ চোখ না লাগে। স্বামীর নাম নেওয়া যাবে না, তাতে অমঙ্গল হয়। ঘর থেকে বের হওয়ার সময় পেছনে তাকানো যাবে না, তাতে যাত্রা অশুভ হয়। কুর ‘আনের আয়াতের সাথে হাবিজাবি দু’ আ লেখা তাবিজ পড়ি, যেন অসুখ না হয়। —এরকম শত শত ভুল ধারণায় আমরা বিশ্বাস করি, কারণ আমাদের জ্ঞান থাকলেও প্রজ্ঞা আসেনি। আমরা শিখিনি আমাদের জ্ঞান কীভাবে কাজে লাগাতে হয়।

হিকমাহ খুব সহজে বলতে গেলে বলা যায় –

১। একজন ব্যক্তি জানে যে আগুন পুড়ায় তবুও সে এটাকে স্পর্শ করল–এই ব্যক্তির জ্ঞান আছে কিন্তু হিকমাহ নেই।

২। আর যে ব্যক্তি জানে যে আগুন পুড়ায় এবং সে এটা স্পর্শ করে না–এই ব্যক্তির জ্ঞান এবং হিকমাহ উভয়ই আছে।

এ কারণে কারো জ্ঞান থাকতে পারে কিন্তু হিকমাহ বা জ্ঞান থেকে কাজ করে উপকৃত নাও হতে পারে। অর্থাৎ জ্ঞান থাকলেও হিকমাহ না-ও থাকতে পারে।

একজন ব্যক্তি জানে আগুন পুড়ায় এবং জানা সত্বেও সে এটা থেকে উপকার নিতে পারলো না, তার মানে তার জ্ঞান আছে কিন্তু হিকমাহ বা প্রজ্ঞা নেই।
আর যে ব্যক্তি আগুন পুড়ায় জানে এবং এর অপকারিতা থেকে দূরে থেকে উপকার নেয়, সেই ব্যক্তির জ্ঞান (আগুন পুড়ায়) এবং হিকমাহ (পুড়ানো থেকে দূরে থাকা, রান্না করা) আছে।
কেউ নেশা করে, সে জানে নেশা খারাপ জিনিস। এটা জ্ঞান। তবুও সে নেশা করে। তার জ্ঞান আছে কিন্তু এই জ্ঞান থেকে যেহেতু উপকার পায় না, উপকৃত হতে পারছে না, তাই এই ব্যক্তির হিকমাহ নেই

অর্থাৎ হিকমাহর সম্পর্ক জ্ঞানের সাথে, যে জ্ঞান থেকে উপকার নেওয়া হয়।

সুতরাং হিকমাহ খুবই শক্তিশালী জিনিস।এ কারণে আমরা দেখি অনেকেই কেবল পড়তেই থাকে, শিখতেই থাকে, জানতেই থাকে…তারা কেবলই জ্ঞানার্জন করে, হিকমাহ শিক্ষা করে না। তারা কেবল নিয়ম-কানুন শেখে, শেখে না হিকমাহ।

কিন্তু রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কেবল আইন বা নিয়ম-কানুনই শেখাতেন না, কীভাবে এটা প্রয়োগ করতে হবে (সুন্নাহ), ধরে থাকতে হবে এবং উপকৃত হতে হবে, সেটাও শিক্ষা দিতেন। অর্থাৎ জ্ঞানের প্রায়োগিক দিক (Practical Dimension) হলো হিকমাহ বা প্রজ্ঞা।

হিকমাহ বলতে এটা বুঝায় না যে উচ্চতর, গভীর ও তাত্ত্বিক আলোচনা, বরং (জ্ঞানের বাস্তবিক) পরিচর্যাই (তারবিয়্যাহ) হলো হিকমাহ। একারণে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাহাবাদেরকে (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম) কোনো জিনিস শিখিয়ে দিতেন এবং কীভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে সেটাও শিক্ষা দিতেন। এভাবে তারা যদি ভুল করতো, তবে তাদের ভুলকে বিশুদ্ধ করে পূনরায় করতে বলতেন। এভাবে হিকমাহর তারবিয়্যাহ চলত। মহান আল্লাহ বলেন---

আর স্মরণ করুন, যখন আল্লাহ নবীদের অঙ্গীকার নিয়েছিলেন যে, আমি তোমাদেরকে কিতাব ও হিকমত যা কিছু দিয়েছি; তারপর তোমাদের কাছে যা আছে তার সত্যায়নকারীরূপে যখন একজন রাসূল আসবে- তখন তোমরা অবশ্যই তার প্রতি ঈমান আনবে এবং তাকে সাহায্য করবে। তিনি বললেন, ‘তোমরা কি স্বীকার করলে? এবং এর উপর আমার অঙ্গীকার কি তোমরা গ্রহণ করলে? তারা বলল, “আমরা স্বীকার করলাম। তিনি বললেন, তবে তোমরা সাক্ষী থাক এবং আমিও তোমাদের সাথে সাক্ষী রইলাম। আলে ইমরানঃ ৮১

ইসলামের কল্যাণময় হিকমাহপূর্ণ বই লিখেই ভারতগুরু শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভী (রাহিমাহুল্লাহ) সমস্ত স্কলারদের মাঝে সমাধৃত হয়েছেন। তিনি তাঁর বিখ্যাত বই “হুজ্জাতিল্লাহিল বালিগাহ” বা ‘আল্লাহর প্রমাণ স্বয়ং পরিপূর্ণ’ – বইতে ইসলামের আইন-কানুনগুলোর প্রত্যেকটির মাঝে কেমন কল্যাণ নিহিত এবং হারাম জিনিসগুলোর মাঝে কিরুপ ব্যক্তিক ও সামষ্টিক অকল্যাণ রয়েছে সেগুলোর হিকমাহ সুনিপুনভাবে তুলে ধরেছেন। একারণেই সেই সময়ে বইটি মুসলিম-অমুসলিম সবার কাছেই প্রিয় ছিল।

নবী-রাসূল পাঠানোর অন্যতম উদ্দেশ্য হলো হিকমাহ শিক্ষা দেওয়া (সূরা বাকারাহ-১২৯)।

رَبَّنَا وَٱبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْهُمْ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَـٰتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِتَـٰبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْۚ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ

হে আমাদের রব! আর আপনি তাদের মধ্য থেকে তাদের কাছে এক রাসূল পাঠান, যিনি আপনার আয়াতসমূহ তাদের কাছে তিলাওয়াত করবেন; তাদেরকে কিতাব ও হেকমত শিক্ষা দেবেন এবং তাদেরকে পরিশুদ্ধ করবেন। আপনি তো পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়’ । বাকারাঃ ১২৯

সুতরাং ইসলামের প্রত্যেকটা জিনিসের মাঝে স্বভাবগতভাবেই কল্যাণ নিহিত রয়েছে। সুতরাং ইসলাম অন্ধ বিশ্বাস নয়, বরং জ্ঞান এবং এ জ্ঞানের উপকার না জানার ফলেই আমাদের কাছে কেবল হালাল-হারাম বলতে বলতে মুখ তিতা করে ফেলি আর এর হিকমাহকে তুলে আনি না আর ইসলামও আমাদের কাছে কেবল গতবাধা কিছু নিয়ম-কানুনের সমষ্টি মনে হয়, যে ইসলামের প্রতি অন্যরা খুব কমই আকৃষ্ট হয়।

ইসলামের উদ্দেশ্য কীভাবে বাস্তবায়িত হবে, বা ইসলামের সৈনিক কীভাবে তৈরি হবে, কীভাবে ইসলামিক কর্মীবাহিনী গড়ে ইসলামী কাজের জন্য প্রস্তুত করতে হবে সেই স্ট্রাটেজিক বা প্ল্যানের ধারাবাহিক বর্ণনায় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা’য়ালা বলেনঃ

“তিনিই উম্মি বা নিরক্ষর জাতির মধ্যে তাদের একজনকে পাঠিয়েছেন রাসূলরুপে, যিনি তাদের নিকট

১। তাঁর আয়াতসমূহ (নিদর্শন, আয়াত) আবৃতি করেন,

২। তাদেরকে পবিত্র করেন,

৩। শিক্ষা দেন কিতাব,

৪। ও হিকমাহ

যদিও ইতোপূর্বে তারা ছিল স্পষ্ট পথভ্রষ্টতায়" ।– সূরা জুমুয়াহ – ২

ঠিক এই ধারাবাহিক পদ্ধতিতেই মক্কার সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট লোকেরা (আয়াতের শেষ- "যদিও ইতোপূর্বে তারা ছিল স্পষ্ট পথভ্রষ্টতায়") সর্বাপেক্ষা উত্তম এবং দুনিয়ার নেতা হয়ে গিয়েছিল। এই ধারাবাহিক পদ্ধতিতে কাজ করে গেলে এমন নিকৃষ্ট লোকদেরকে এমন উচ্চতায় নিয়ে আসবেন আল্লাহ যে, আমি-আপনি কখনো চিন্তাই করতে পারবো না।

আপনি বলতে পারেন আয়াতে তো আল্লাহ উম্মিদের জন্য বলেছেন এই ফর্মুলা অর্থাৎ যারা বিশুদ্ধ অর্থে শিক্ষিত ছিল না। কিন্তু পরের আয়াতেই এই ফর্মুলা সমস্ত বিশ্বের জন্য। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বললেনঃ

"আর তাদের অন্যদের জন্যও যাদের সাথে এখনও মিলিত হয়নি। তিনি (আল্লাহ) পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাবান" । (আয়াত – ৩)

অর্থাৎ "অন্যদের জন্যও" একই ফর্মুলা – মাক্কার উম্মিরা ব্যতীত আমরা সবাই অন্যরা যাদের সাথে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বা সাহাবাদের কারোরই হয়তো সাক্ষাত হবে না কিন্তু আল্লাহ যেহেতু পরাক্রমশালী(আল-আযীয) বা সমস্ত রাজত্ব তারই এবং কর্তাও তিনি, তিনি সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান এবং প্রজ্ঞাবান(আল-হাকীম) – তাই তাঁর সমস্ত রাজত্ব তাঁর পরাক্রমশীলতা এবং প্রজ্ঞার দ্বারা এই ফর্মুলাকে চিরন্তন করে দিলে সমস্ত জগতবাসীর উপর। অর্থাৎ ওহীর সেই সময় থেকে আগত-অনাগত যতলোক আসবে এবং এই ফর্মুলাকে কেন্দ্র করে চলবে, তারাও পাবে যদি আল্লাহর নেয়ামত প্রাপ্ত হয় (আয়াত-৪)। সুবহানাল্লাহ!!
আর আয়াতে যে 'হিকমাহ' শব্দটা রয়েছে তার অর্থ ইমাম মালিক ও শাফেয়ী (রাহিমাহুমুল্লাহ) বলেনঃ হিকমাহ হলো সুন্নাহ। হ্যা, ঠিক এটাই, কারণ সুন্নাহ হলো উদাহরণসহ প্রায়োগিক দিক – Practical Dimension.

– সুতরাং যার অন্তর এখনও পবিত্র হয়নি, প্রস্তুত হয়নি – আল্লাহর নিদর্শনাবলী না দেখে বা না পেয়ে, তাকে ইসলামী আইনের হিকমাহ শিক্ষা দেওয়া হলে কি সে সেটা নেবে? কারণ তার অন্তর নেওয়ার মত নেই, পবিত্র অন্তর পবিত্র কালামের পবিত্র শিক্ষা এবং হিকমাহর জন্য প্রস্তুত থাকে। নতুবা যখনই দেওয়া হোক যুক্তি, বিজ্ঞান – নেবে না। কারণ আল্লাহর দেওয়া ধারাবাহিক পদ্ধতি হিকমায় পূর্ণ। অন্তরের পবিত্রতা যেকোনো ভালো কিছু অন্তরে প্রবেশের পূর্বশর্ত।

এই ধারাবাহিক পদ্ধতিই দাওয়াত, ইসলামী আন্দোলনের একনিষ্ঠ কর্মী গড়ে তুলতে, ইসলামের নেতা তৈরি করতে ব্যবহার করতে হবে…এটাই আল্লাহর ধারাবাহিক পদ্ধতি, প্রজ্ঞাময় কুরআনের (সূরা ইয়াসিন) প্রজ্ঞাময়

(বাস্তবতাময় কল্যাণকর-সফলতার) পদ্ধতি। যার বাস্তবিক দৃষ্টান্ত রাসূল (সাল্লাল্লাহু ওয়া সাল্লাম) ও পরবর্তী বংশধররা রেখে গেছেন।

Source Help: Bayyinah.Tv,